The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 51-66 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

ভাষার শব্দকেন্দ্রিকতা এবং বাংলা শব্দের ব্যবহার ও প্রচল-অচল প্রসঙ্গ

সালমা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Since words are the most basic expressive-elements of a language, this article explores the necessity of interpreting words used in Bengali written language with a precise theoretical background as well as historical perspectives. It also identifies the trends of using Bengali words by creative writers in different pragmatic contexts of Bengali daily life and culture. It emphasizes writers' process of making new words to make their writings esthetically sound and illustrated. Finally, this article describes the technique how enormous Bengali words denoting old cultural practices are going to be extinct gradually, at the same time various new words which are created with a view to fulfilling the demand of globalized new culture.

চাবিশব্দ : অচলতা, কাঠামোবাদ, দ্যোতক অবয়ব, বিকল্প দ্যোতক, ভাষিক চিহ্ন, সংজ্ঞাপন প্রতিবেশ

ভূমিকা

শব্দ একটি ভাষার সবচেয়ে দৃশ্যমান উপাদান। এই দৃশ্যমান উপাদানের সামবায়িক গঠনগত বিন্যাসেই এর বাক্যরূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে। আবার এই শব্দ উচ্চারণের দ্বারাই ভাষার ধ্বনি ও এর অন্তর্সূত্রের অবয়বটিকে ধরা যায়। অন্যদিকে ভাষার যে অর্থবোধ

মানুষের সংজ্ঞাপনকর্মকে পূর্ণতা দান করে তা-ও মূলত শব্দকেন্দ্রিক। কেননা, একটি বাক্য বা বাক্যবোধের বিভিন্ন উপাদান তথা শব্দের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র অর্থের সমবায়েই ঐ বাক্যের প্রসঙ্গনির্ভর যে বাক্যার্থ তৈরি হয়, তার দ্বারাই বক্তা-শ্রোতার সংজ্ঞাপনক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। উপরিউক্ত বিবেচনায় শব্দকে একটি ভাষার কেন্দ্রীয় উপাদান রূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাষার এই উপাদানটির ব্যবহার ও জন্ম-মৃত্যু বা প্রচল-অচলের বিষয়টি নৈমিত্তিক, প্রাত্যহিক অথচ তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথিবীর সব ভাষাতেই প্রায় অভিন্ন প্রক্রিয়াতেই শব্দের এই নৈমিত্তিক ব্যবহারসহ জন্ম-মৃত্যুর খেলা নিরন্তর চলতে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা ভাষার বিভিন্ন শব্দের বিচিত্রমাত্রিক চালচলন ও এর প্রচল-অচলের অনিবার্য প্রসঙ্গটিকে বর্ণনামূলক রীতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও শব্দকেন্দ্রিক ব্যাকরণ চর্চা

প্রথাগত ব্যাকরণের উন্মেষের যুগে পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে ভাষা-বিশ্লেষণ ভিত্তিক ব্যাকরণ চর্চার ঐতিহ্য লক্ষণীয়, সেখানেই ভাষার শব্দ বিষয়ক আলোচনাই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণ ঐতিহ্য সর্বাগ্রে বিবেচ্য। প্রাচীন ভারতে 'একদল ভাষাতাত্ত্বিক শব্দকে ঐশী বস্তুতে পরিণত করেছিলেন। তাদের মতে : সমগ্র বিশ্ব ও বস্তু শব্দে স্থির, শব্দই বিশ্বসার, আর 'শব্দব্রহ্মা'র বিবর্ত হচ্ছে অন্যান্য বস্তু' (আজাদ ১৯৯২: ২৩)। অর্থাৎ শব্দকে তাঁরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পর্যবেক্ষণ-সম্ভব জগতের আধার বিবেচনার পাশাপাশি একে পরম ব্রহ্মা রূপে কল্পনা করেছেন যার থেকে চারপাশের বিচিত্র বস্তুজগতের সৃষ্ট হয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণে শব্দের তিনটি মাত্রা আছে, যথা-রূপ, ধ্বনি ও অর্থ। আর ভাষার এই তিনটি মৌলিক উপাদানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণশাস্ত্রের আওতা ও পরিধি। তাই হয়তো প্রাক-পাণিনীয় যুগে এ অঞ্চলে শব্দবিশ্লেষণ শাস্ত্রকেই 'ব্যাকরণ' বলা হতো (আজাদ ১৯৯২)। শুধু তাই নয়, আজাদের (১৯৯২) মতে, পতঞ্জলিও তাঁর *মহাভাষ্য* গ্রন্থে ব্যাকরণ তথা ভাষা-বিশ্লেষণকে 'শব্দানুশাসন' বলে অভিহিত করেছিলেন। মূলত শব্দের প্রাধান্য-নির্ভর এ ধরনের ব্যাকরণ চর্চা শুধু প্রাচীন ভারতেই নয়, বরং গ্রীক ও রোমান সভ্যতায়ও বর্তমান ছিল।

২. সোস্যুর ও শব্দরূপের প্রতীকী ব্যাখ্যা এবং কাঠামোবাদের উন্মেষ

প্রাচীন ভারতসহ অন্যান্য অঞ্চলে শব্দকেন্দ্রিক ব্যাকরণ চর্চার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটলেও মধ্য ও আধুনিক যুগে তার প্রভাব নানাভাবে কমতে শুরু করে। তবে ভাষাচর্চার নানা ঘরানা ও বিভিন্ন পদ্ধতি-প্রকরণের অস্তিত্বের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তা অব্যাহতও

থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যযুগের শেষে ইউরোপে তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান পর্বে ভাষাবিজ্ঞানীরা একটি ভাষার দুটি রূপের কালগত তুলনা ও বিশ্লেষণের জন্য যেমন ঐ ভাষার বিভিন্ন শব্দরূপকেই অন্যতম উপাত্ত রূপে বিবেচনা করতেন, তেমনি ভিন্ন দুটি ভাষার রূপগত ব্যাখ্যার জন্য ঐ ভাষা দুটির শব্দকেই মানক ধরতেন। কিন্তু বিংশ শতকের প্রারম্ভ লগ্নে প্রাগ স্কুলের প্রভাবশালী সদস্য ত্রুবেস্কয় কর্তৃক ধ্বনিমূল (phoneme) ধারণার উদ্ভাবনের ফলে ভাষার ধ্বনিভিত্তিক আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আবার ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত *Syntactic Structures* গ্রন্থে চমস্কি যখন ভাষিক প্রাণী মানুষের বাক্যবোধ ও তাদের অফুরন্ত বাক্য সৃজনধর্মের ক্ষমতাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেন, তখন থেকেই সমগ্র বিশ্বের বিদ্যায়তনিক পরিম-লে বাক্য ও এর উপাদানই হয়ে ওঠে ভাষা বিশ্লেষণের প্রধান আলোচ্য বিষয় রূপে। কিন্তু ভাষা বিশ্লেষণের এ দুটি প্রধান ধারা বিকাশ লাভের পূর্বেই আধুনিক সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের জনক সোস্যুর ভাষার শব্দকে একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক চিহ্ন রূপে বিবেচনা করে নতুন করে একে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিস্থাপিত করার পাশাপাশি শব্দ-চিহ্নের অভ্যন্তর কাঠামো উন্মোচনে তৎপর হন। ফলশ্রুতিতে ভাষাবিজ্ঞান তথা সামাজিক বিজ্ঞানে জন্মলাভ করে কাঠামোবাদ নামে এক নতুন বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও ঘরানার।

কাঠামোবাদের প্রধান পুরুষ সোস্যুরের কাছে একটি ভাষিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অভ্যন্তর কাঠামোতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন চিহ্ন-ব্যবস্থার প্রতিটি উপাদানই এক একটি চিহ্ন। তবে তিনি এই সব চিহ্নের ভাষিক প্রকাশ রূপে 'শব্দ'কেই চিহ্নবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করেছেন। সোস্যুরের ধারণা সম্পর্কে আরিফ (২০১১) বলেন-

জীবন ও সংসারের প্রতিটি সিস্টেমের অভ্যন্তরস্থ উপাদানসমূহ 'চিহ্ন'র সংজ্ঞাভুক্ত হলেও সোস্যুর ভাষা সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান 'শব্দ'কেই চিহ্নের মানক ধরেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত প্রতিটি তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় 'ভাষা' ও 'শব্দ'ই নানাভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। (আরিফ ২০১১: ২৩)

সোস্যুর শুধু কেন্দ্রীয় ভাষিক রূপ 'শব্দ'কে চিহ্ন বিশ্লেষণের নির্ভরযোগ্য একক রূপে বিবেচনা করেই ক্ষান্ত হননি, বরং একটি চিহ্নের অন্তর-কাঠামো ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র রূপেও শব্দকেই নির্বাচন করেছেন। তাঁর মতে, চিহ্ন রূপে পরিগণিত হওয়ার জন্য একটি শব্দকে দুটি যোগ্যতা বা উপাদানকে ধারণ করতে হয়। এ দুটি

উপাদানের একটি হচ্ছে-ঐ শব্দ সম্পর্কে ভাষাভাষীর মনোগত ধারণা এবং অন্যটি-উক্ত ধারণা সংশ্লিষ্ট দৃশ্যমান বা শ্রুতিগত রূপটি। এ বিষয়টিকে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

সোস্যুরের ব্যাখ্যায় ভাষার প্রতিটি শব্দই হচ্ছে এক একটি 'ভাষিক চিহ্ন' (linguistic sign)। আর একটি শব্দের চিহ্ন হিসেবে পরিগণিত হওয়ার প্রয়োজন দুটি যোগ্যতা বা ধারণার - যা প্রতিটি শব্দের মধ্যে লক্ষ্যযোগ্য। এ দুটির সোস্যুরীয় অভিধা হচ্ছে- [signifiant] signifier এবং [signifié] signified, বাংলায় 'দ্যোতক' ও 'দ্যোতিত'। (আরিফ ২০১১: ২৩)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে দ্যোতক ও দ্যোতিতের সুমিত সম্মিলনেই একটি ভাষিক শব্দ চিহ্ন রূপে মর্যাদা লাভ করে যেখানে দ্যোতকটি শব্দের লিপিরূপ, ধ্বনিমূর্তি বা শ্রুতিগত উপাদানকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, দ্যোতিতটি শব্দটি সম্পর্কে এর ভাষাভাষীর মানসিক ধারণাকে সূচিত করে। শব্দ-চিহ্নের এ ধরনের অভ্যন্তর কাঠামোর স্বরূপ নির্ণয় বিষয়ক আলোচনাই পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে কাঠামোবাদ নামক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির জন্ম দেয়, যার দ্বারা শব্দ-চিহ্নের পাশাপাশি একটি ভাষিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন চিহ্ন-ব্যবস্থার সকল চিহ্ন-এককেই সাংগঠনিক ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

সোস্যুরের শব্দ-চিহ্নের উপরিউক্ত কাঠামো ভিত্তিক বিশ্লেষণ অন্যতম ভাষিক উপাদান শব্দকে এক নতুন মর্যাদায় উন্নীত করে। কেননা, সোস্যুরের এই ধরনের সাংগঠনিক ব্যাখ্যার ফলে 'শব্দ' অভিধাটি শুধু ভাষার অন্যতম এককের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটি হয়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট ভাষিক-গোষ্ঠীর বিভিন্ন চিহ্ন-ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী চিহ্ন-একক।

৩. শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহারধর্ম

শব্দকে একটি নির্দিষ্ট ভাষা-গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় ভাষিক উপাদান ও এর বিবিধ চিহ্ন-ব্যবস্থার একক রূপে যথাক্রমে ব্যাকরণ ও চিহ্নতত্ত্বে উপরিউক্ত প্রাধান্যবাদী বিশ্লেষণ যুগে যুগে লক্ষণীয় হলেও ভাষাভাষীরা তাদের প্রাত্যহিক ও নৈমিত্তিক জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে একে শুধু পাংশুটে প্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হন না, বরং সময়ান্তরে তাঁরা এর মধ্যে আরোপ করেন নানা অলৌকিকতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, মায়া ও কুসংস্কার ইত্যাদি। অনেক ধর্মবিশ্বাসীদের কাছে কিছু শব্দ সবসময় এক রহস্যময় সত্তা রূপে আবির্ভূত হয়। তাঁরা এর মধ্যে খুঁজতে শুরু করেন বিভিন্ন যাদু ও অলৌকিক ক্ষমতা। আবার আদিম সাংস্কৃতিক আবহে জীবন-

যাপনকারী কিছু মানুষ মনে করে যে কতিপয় শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল জড়িত, কোন কোন শব্দ উচ্চারণ (নামকীর্তন) করলে তাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ইত্যাদি (দাস, ১৯৯৫)। এভাবেই এক একটি শব্দ ভাষাভাষীদের দীর্ঘদিনের ব্যবহারের দ্বারা হয়ে ওঠে রঙিন, বহু অর্থময় ও ইতিহাসবোধ সম্পন্ন যা প্রকারান্তরে অভিধান রচয়িতার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ফলে দিনে দিনে ইতিহাসের পলি জমে এক একটি শব্দ ধারণ করে বিচিত্র লোক-বিশ্বাস ও জনশ্রুতিকে। আর এগুলোর বিশ্লেষণের জন্যে অভিধানকারেরা যে ব্যুৎপত্তিমূলক অভিধান প্রকাশ করেন তাতে যেমন পাওয়া যায় শব্দের অর্থ পরিবর্তনের নানা বাঁক ও বৈশিষ্ট্যকে, তেমনি এতে বর্ণিত থাকে বিচিত্র ধরনের আনুমানিক, কল্পিত, ও অপ্রমাণিত ব্যাখ্যা (আজাদ, ১৯৯৮)। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, শব্দ নিয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে উপরিউক্ত ধোঁয়াশা ও রহস্যময়তা থাকলেও আধুনিক, লোকবিশ্বাসী, প্রথাবাদী সকলের কাছেই শব্দ একটা বাস্তব ব্যাপার যা উচ্চারণ করা যায়, শোনা যায়, লেখা যায় এবং পড়া যায় (দাস, ১৯৯৫)। শুধু তাই নয়, মানুষ তাদের ভাষার এসব শব্দরাজি ব্যবহার করে সামাজিক প্রাণী হিসেবে তাদের নৈমিত্তিক সংজ্ঞাপনকর্ম সম্পন্ন করার জন্য। আবার অন্যদিকে দীর্ঘদিনের অব্যবহারের কারণে কোন কোন শব্দ শুধু যে মানুষের দৈনন্দিন অনুশীলন থেকে হারিয়ে যায় তা-ই নয়, বরং অভিধানকারের তালিকা থেকেও অলক্ষ্যে খসে পড়ে। নিম্নের আলোচনায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের এই দ্বিবিধ সত্তার স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. বাংলা শব্দের সৃজন ও ব্যবহারবৈচিত্র্য

অন্যান্য অনেক ভাষার মতো বাংলায়ও কিছু শব্দ আছে সুপ্রচলিত এবং কিছু আছে অপ্রচলিত। বাংলা ভাষার লিখিত রূপের অধিকাংশ সুপ্রচলিত ও অপ্রচলিত শব্দ ইতোমধ্যে অভিধানে গৃহীত ও সংকলিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। তবে একথাটিও সর্বাংশে সত্যি নয়। কেননা, একটি ভাষার যাবতীয় শব্দকে অভিধানের ফ্রেমে আটকে রাখা সম্ভব নয়। কারণ শব্দ যেহেতু কোন ভাব বা ধারণার চিহ্নময় প্রকাশ, তাই নিত্য আগত নতুন ধারণা বা ভাবের প্রকাশক রূপে শব্দকে তাৎক্ষণিক ভাবে একটি ভাষার অভিধানে লিপিবদ্ধ করা হয় না, যদিও কোনো কোনো ভাষা যেমন-ইংরেজিতে বর্তমানে এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। তারপরেও বলা যায় যে অভিধান হচ্ছে একটি ভাষার নিজস্ব ভাব-দ্যোতক চিরায়ত শব্দরাজির গুদামঘর। ফলে একজন লেখক বা ভাষা ব্যবহারকারী যেহেতু ভাষার সকল শব্দই এক সাথে মনে রাখতে পারেন না, তাঁরা প্রয়োজনীয় শব্দসমূহ ইচ্ছেমত অভিধান থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। একটি

ভাষায় অভিধান থেকে ভাষাভাষীর শব্দ ব্যবহারের এই হচ্ছে চিরন্তন রীতি। এই প্রক্রিয়ায়টি বাংলা ভাষাভাষীরাও অভিন্ন রীতিতে অনুসরণ করেন।

অভিধানে গৃহীত শব্দরাজি ছাড়াও বাংলা ভাষায় আরও অনেক নিত্য ব্যবহার্য শব্দ আছে যেগুলো অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত কৌলিন্য এখনও অর্জন করেনি। কিন্তু তাই বলে এদের প্রাত্যহিক ব্যবহার থেমে থাকেনি মুহূর্তের জন্যও। এগুলো নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে, যেমন: আড্ডা, সভা, সমিতি, বক্তৃতা মঞ্চে এমনকি পত্র-পত্রিকা ও জনপ্রিয় গল্প- উপন্যাসেও। উদাহরণস্বরূপ, গিরিঙ্গি, গ্যাজানো, ধামাকা ইত্যাদি অপ-শব্দ এখন বাঙালি জন-জীবনে, বিশেষ করে নাগরিক আবহে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। আবার বাংলা ভাষায় এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উদ্ভব ও ব্যবহার একেবারেই অঞ্চলভিত্তিক। এগুলো বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়ে প্রাণবান হয়ে ওঠে, যদিও নাগরিক জীবন প্রবাহে মঝে মাঝে এরা উঁকি-ঝুঁকি মারার জন্য সচেষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ, হেতা(সে(পুং)-হেতি(সে(স্ত্রী), বাহে (ভাই), মাত (কথা), গম (ভাল), মনু (মানুষ, বন্ধু), খাইবাম (খাব) ইত্যাদির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪.১ লেখকদের শব্দ সৃজন ও ব্যবহার-স্বাতন্ত্র্য

উপরে উল্লেখিত অভিধান-ভিত্তিক শব্দ এবং নৈমিত্তিক শব্দাবলি ছাড়াও বাংলা ভাষার অনেক শব্দ আছে যেগুলোর সৃজন ও প্রয়োগ একান্ত অর্থেই শক্তিশালী লেখকরা করেছেন। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ও দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহে এগুলোর ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার সাধারণত ঘটে না। লেখকদের রচিত বিভিন্ন সাহিত্যকর্মেই এগুলো ক্রিয়াশীল। বাঙালি সাহিত্যিক বিশেষ করে, কবিদের মধ্যে নতুন ও অভিনব এসব শব্দ তৈরির ব্যাপারে মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে প্রমুখ অগ্রগণ্য। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে পণ্ডিমানী, অগ্রসরতা, পূর্ণিত, তনিমা, মধুরিমা, গরিমা, অন্বিষ্ট, আবরিত, অধিদেবতা, প্রতর্ক, অবকীর্ণ, ঐতিহ্য, অনুকল্প, প্রমা, নির্মোক প্রভৃতি অজস্র শব্দ। বলা বাহুল্য উল্লেখিত শব্দসমূহের সবগুলোই পরবর্তীতে চালু হয়নি, যদিও কোনো কোনোটি আবার সাধারণভাবে ভাষায় প্রচলিত হয়ে গেছে, যেমন- প্রমা, ঐতিহ্য, অগ্রসরতা, অন্বিষ্ট ইত্যাদি। আবার এঁদের কিছু শব্দ শুধু সাহিত্য-সমালোচকের প্রবন্ধে মাঝে মাঝে দেখা যায় (ভট্টাচার্য, ১৯৯২)। মাইকেল মধুসূদনের প্রকাশিলাম, অপেক্ষিলাম, উদ্‌ঘাটিলাম প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার প্রতিভার স্বাক্ষর ছাড়া আর কী হতে পারে? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নিজস্ব রীতিতে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান গাব' শুনে বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মতে 'চাহ' হতে 'চাইব', 'কহ' হতে 'কইব', প্রভৃতি নিয়মে 'গাহ' হতে 'গাইব' হওয়া যথোচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কথ্যরীতি হতে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন 'গাহ' হতে 'গাব' চাহ হতে 'চাব', কহ হতে 'কব', ইত্যাদি হতে বাধা নেই (ঠাকুর, ১৯৩৮)।

কবি নজরুলের নিজস্ব শব্দ তৈরির ক্ষমতাও বেশ অভিনব ও তাৎপর্যপূর্ণ। 'সাদৃশ্য' যে শব্দ শব্দ তৈরির একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল হতে পারে তা নজরুলের ভালই জানা ছিল। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করে তিনি এ পদ্ধতিতে বেশ কিছু শব্দ তৈরির মাধ্যমে কবিতায় ব্যবহার করেছেন যেগুলো বাংলা ভাষায় অনেকটাই তুলনারহিত ও অনন্য। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাদৃশ্যজাত বেশকিছু শব্দের উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে, যেমন- 'আন্দাজিক্যালি' (politically-র সাদৃশ্যে), 'আড়ষ্ট-কাক' (aristrocrat-র সাদৃশ্যজাত ব্যঙ্গাত্মক রূপ), 'ক্ষুরসুন্দর' ('নরসুন্দর'-র সাদৃশ্যে), 'গন্ধতুত' ('মাসতুত' ইত্যাদির সাদৃশ্যে), 'চুমারি' ('কুমারী'-র সাদৃশ্যে), 'নর-বর' ('গোবর'-র সাদৃশ্যে), 'গোবরমন্ত' ('পয়মন্ত'-র সাদৃশ্যে), 'বন্ধুজ' ('বনজ'-র সাদৃশ্যে), 'মৌ-লোভী' ('মৌলভী'-র সাদৃশ্যে), 'হিংসাশী' ('মাংসাশী'-র সাদৃশ্যে) ইত্যাদি (আরিফ ১৯৯৮)। উল্লেখ্য, নজরুল সৃষ্ট সাদৃশ্যজাত এই শব্দগুলোর মধ্যে একমাত্র 'মৌ-লোভী' ছাড়া আর কোনটিই সাধারণ্যে চালু হয়নি। তবে ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষীরা নজরুল সৃজিত উপরি-উক্ত শব্দরাজি থেকে 'চুমারি', 'বন্ধুজ', 'হিংসাশী' ইত্যাদি প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপনকর্মে চালু করা যায় কিনা ভেবে দেখতে পারেন।

নতুন শব্দ সৃষ্টিতে কবিদের তুলনায় গদ্যকারদের স্বাধীনতা কম। কেননা, একই শব্দকে নানা ব্যঞ্জনায়, নানা লক্ষ্যণায়, নানা তাৎপর্যে ব্যবহার করতে কবিগণ সিদ্ধহস্ত। কিন্তু গদ্যকারদের সরল, সোজা, একরৈখিক শব্দ না হলে তাঁদের রচনার ভাব অনাবিষ্কৃত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গদ্যকারদের গতানুগতিক, প্রথাসিদ্ধ শব্দ ব্যবহার করতে হয়, শুধু ব্যতিক্রম কমলকুমার মজুমদার।

কবি এবং গদ্যকারসহ সব সৃষ্টিশীল লেখকরাই তাঁদের নিজস্ব কল্পনা ও ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের জন্য স্বসৃষ্ট শব্দরাজি ছাড়াও প্রায়শই আভিধানিক শব্দের আশ্রয় নেন। তবে লেখকরা ভাষা পরিচর্চায় নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার লক্ষে তাঁদের রচনাকর্মে যদি অতিমাত্রায় অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ ব্যবহার করেন, তবে এসব শব্দ দিয়ে সাজানো তাঁদের লেখাকে দুর্বোধ্যতার গ্লানি পোহাতে হয়। তাই একটি ভাষার নিয়মিত এবং অগ্রগণ্য লেখককে তাদের অনুরক্ত এবং অগ্রসর পাঠকের মননশীলতাকে পুষ্ট এবং তৃপ্ত

করার জন্য অভিধানের বহুল প্রচল ও অপ্রচল শব্দের পাশাপাশি নিত্যনতুন শব্দের দ্যোতনায় রসসিক্ত করতে হয়। আর উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যেই সৃষ্টিশীল লেখকদেরকে প্রতিনিয়ত নতুন শব্দ সৃজন করতে হয়। কেননা, আমরা জানি যে নতুন শব্দ মানে নতুন ভাব, নতুন বস্তু, নতুন রসের চিহ্নময় প্রকাশ।

৪.২ বাংলা শব্দের বিকল্প দ্যোতকের প্রস্তাবনা

উপরের আলোচনায় সোস্যুরের শব্দচিহ্নের কাঠামোবাদী বিশ্লেষণে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে একটি শব্দ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীর মনোগত ধারণা বা দ্যোতিতের লিপিরূপ, ধ্বনিমূর্তি বা শ্রুতিরূপের প্রকাশটিই হচ্ছে তার দ্যোতক। বিভিন্ন সময়ে ভাষাভাষীর ভাষিক আচরণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে একটি ভাষিক-গোষ্ঠীতে সংশ্লিষ্ট ভাষাভাষীরা একটি শব্দচিহ্ন সম্পর্কে অভিন্ন অভিজ্ঞতা বিনিময় করে বলে ঐ শব্দের দ্যোতিত বিষয়ে একই রকম মানসিক ধারণা থাকলেও এর এক বা একাধিক দ্যোতক থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি শব্দচিহ্নের একাধিক নামবাচকতা থাকতে পারে। আর এ ধরনের একাধিক দ্যোতকায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল লেখক বা কবি-সাহিত্যিকরা অগ্রগণ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বাংলা ভাষায়ও লেখক তথা সৃজনশীল ব্যক্তিত্বরা সময়ান্তরে একই শব্দের একাধিক দ্যোতক প্রস্তাব করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে স্বেচ্ছার ব্যবহার খুব করছি কিন্তু ঐচ্ছিকের মতো স্বৈচ্ছিকের ব্যবহার বহুল ভাবে করছি কি? রবীন্দ্রনাথ optional অর্থে স্বৈচ্ছিকের প্রস্তাব করেছিলেন। একই ভাবে 'স্থির', 'অস্থিরে'র পাশাপাশি আমাদের মাঝে 'অচল' 'সচলে'র বেশ প্রচলন আছে। কিন্তু অচির (ক্ষণস্থায়ী) কিংবা অচর (অচল) প্রভৃতি শব্দ আমাদের উপলব্ধিতে সেভাবে কাজ করে না। যদিও এসব শব্দের আভিধানিক স্বীকৃতি রয়েছে। 'ব্যত্যয়', 'প্রত্যয়' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আমাদের প্রত্যয়নপত্র পেতে বেগ পায়নি, কিন্তু অপগমন বা অতিক্রম অর্থে 'অত্যয়' এর ব্যবহার ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে। গত, বিগত, আগত, অনাগত এগুলোর কোনো বিকল্প নেই। তবে অনাগত দিনের পাশে 'অগত' দিনের কথা স্মরণ করলে ক্ষতি কী? দুর্দৈবে পড়ে আমরা দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হলে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হই। কিন্তু আমরা সহজে বলি না যে 'আক্ষিপ্ত' হয়েছি। নিক্ষিপ্ত-এর সাথে 'আক্ষিপ্ত' শব্দটির ব্যবহার অযুৎসই কিছু নয়, বরং বেশ মানানসই। জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ ফ্যান্টাসির ছলে 'মিথ্যুকের' সাথে মিল রেখে 'সত্যুক' শব্দটির ব্যবহার দেখিয়েছেন তাঁর এক লেখায়। হুমায়ুন ভক্তরা এই সত্যুক শব্দটির গ্রহণ ও ব্যবহার করলে বাংলা ভাষার নতুন একটি শব্দ চল পাবে।

আমরা 'স্বচ্ছে'র ওপর নির্ভর করে 'স্বচ্ছতা'কে পাই, কিন্তু যদি স্বচ্ছের পাশে 'অচ্ছকে' দাঁড় করাতাম তখন অস্বচ্ছের বদলে পেতাম 'অনচ্ছ'কে। এই শব্দটির চমৎকার ব্যবহার দেখিয়েছেন হুমায়ুন আজাদ, যেমন- 'এইভাবে নারী নিশীথের অনচ্ছতা রূপান্তরিত হয় স্বচ্ছতায় এবং খলতা রূপান্তরিত হয় শুদ্ধতায়' (আজাদ, ২০০১)।

৪.৩ সংজ্ঞাপন প্রতিবেশ ও শব্দের অর্থ নির্ধারণ

ভাষায় প্রচলিত প্রতিটি শব্দেরই একটি প্রচলিত বা অভিধানে স্থিরকৃত অর্থ থাকে। এই প্রচল বা স্থিরকৃত অর্থ সহযোগেই শব্দটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা ভাষাভাষীদের মধ্যে লক্ষণীয়। কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহযোগে শব্দের আভিধানিক অর্থ অন্বেষণ করলে দেখা যাবে যে অভিধানে একটি শব্দের এক বা একাধিক বিশেষ অর্থ দেখানো হয়েছে, কেননা প্রকৃতপক্ষে কোনো শব্দেরই সুনির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ নেই। এ বিষয়ে ম্যালিনোভস্কি (১৯২৩), ফার্থ (১৯৫৭), লায়নস (১৯৬৩), ক্রুজ (২০০০), রেভিন ও লিকক (২০০০), কাইকেনস ও জোয়াদা (২০০১) উদ্ধৃত করে দাশ (২০০৪) বলেন–

শব্দার্থতত্ত্বের সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে, এবং শব্দের যে একটি ব্যুৎপত্তিগত প্রাথমিক অর্থ আছে তাকে প্রায় পুরোপুরি অস্বীকার করে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে শব্দের কোন নিজস্ব অর্থ নেই। (পৃ. ৮১)

এই যুক্তি যদি সত্যি হয় তবে প্রশ্ন হচ্ছে, শব্দের অর্থ আসে কোথা থেকে? এর উত্তরে তাঁরা বলেছেন যে অর্থ আসে শব্দের ব্যবহারিক প্রতিবেশ থেকে। নৃতত্ত্ববিদ ম্যালিনোভস্কি দাবি করেন যে কোনো একটি শব্দের অর্থ তার সংজ্ঞাপন-প্রতিবেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। তিনি বলেন-

the meaning of any single word is to a very high degree depended on its context... a word without linguistic context is a mere figment and stands for nothing by itself, so in reality of a spoken living tongue, the utterance has no meaning except in the context of situation. (উদ্ধৃত দাশ, ২০০৪: পৃ.৮১)

তাই যৌক্তিক ভাবেই বলা যায় যে, যে সংজ্ঞাপনকর্মে বক্তা-শ্রোতা কর্তৃক ব্যবহৃত অন্যতম ভাষিক উপাদান যথা- শব্দের অর্থ তার প্রতিবেশ দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, 'তিনি গ্রামের মাথা' কিংবা 'এই ব্যাপারে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই' প্রভৃতি বাক্যে 'মাথা' শব্দটির অর্থের ভিন্নতা দেখেই বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। শব্দের এই প্রসঙ্গভিত্তিক অর্থময়তার জন্যই সংশ্লিষ্ট শব্দটি প্রকৃত পক্ষে কতগুলো ভিন্ন অর্থে সংজ্ঞাপনকর্মে ব্যবহৃত হতে পারে সে সম্পর্কে প্রচলিত অভিধানগুলোতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে না, যেমন: সুভাষ ভট্টাচার্য সংসদ অভিধানের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই অভিধানে 'দিব্যি' শব্দটির একটিমাত্র উদাহরণ (বিশেষ্য) 'মা কালির দিব্যি' দেখানো হয়েছে, অথচ শব্দটি সংজ্ঞাপনকর্মের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিশেষ্য, বিশেষণ এবং ক্রিয়া বিশেষণ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। তাঁর মতে 'একথা সুনিশ্চিত যে, শব্দের প্রয়োগেই তার অর্থ স্পষ্ট হয়' (ভট্টাচার্য, ১৯৯২)। ফলে এই প্রয়োগ নির্দেশের ব্যাপারটি অভিধানে কিংবা বিভিন্ন লেখকদের লেখনিতে যত আসবে শব্দটির চলমানতাও তত বাড়বে এবং এর কমতিতে শব্দটির ব্যবহারও সীমিত হয়ে ওঠবে, যদিও প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রাসঙ্গিক অর্থ-নির্ভর অভিধান রচনা করা আদৌ সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তিনি আমাদের কোন ধারণা দেননি।

৫. শব্দের অচলতার প্রসঙ্গ

শব্দের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন একটি ভাষা তথা এর ভাষাভাষীর প্রকাশ ক্ষমতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়, তেমনি এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষিক উপাদানের অচলতা বা হারিয়ে যাওয়ার কারণে কর্মমুখর জীবন-প্রবাহ ও জ্ঞানের বিচিত্র ক্ষেত্রে ঐ ভাষার ব্যবহার দক্ষতার ঘাটতিকেই সূচিত করে। উপরিউক্ত বক্তব্যটি এই প্রত্যয়কে নিশ্চিত করে যে শব্দের সৃজন ও প্রয়োগ যেমন একটি ভাষার স্বাভাবিক ও অনিবার্য ব্যাপার, তেমনি এদের মৃত্যু বা অচলতাও একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। অর্থাৎ প্রতিনিয়তই কিছু শব্দ একটি ভাষা-ভাণ্ডার থেকে ক্রমাগত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিক কোন্ অন্তর্নিহিত ঘটনা-প্রবাহের কারণে প্রতিটি সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পরিম-লে এসব শব্দের অভিধানের পাতায় আশ্রয় লাভের আগেই জীবনী শক্তি শেষ হয়ে যায়? অথবা, আভিধানিক স্বীকৃতি পাওয়া সত্ত্বেও কিছু শব্দ ভাষাভাষীর প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপনকর্মে ব্যবহৃত হয় না কেন? শব্দের এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দুটি ভাষাতাত্ত্বিক আচরণকে অন্যতম কারণ রূপে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.১ পুরাতন ভাষিক ঘটনাপ্রবাহ ও প্রসঙ্গের মৃত্যু

একটি সুনির্দিষ্ট ভাষিক পরিমণ্ডল থেকে শব্দ অচল হয়ে যাওয়ার পেছনে প্রধান কারণটি হলো শব্দটির সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু, পেশা, গোত্র বা গোষ্ঠীর বিলোপন। বিশেষ করে,

শব্দের অর্থ পরিবর্তনের বা বিলোপনের সবচেয়ে বড়ো কারণ হিসেবে নির্দেশ করা যায় সংশ্লিষ্ট সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এদের বিচ্ছিন্নতাকে। আমরা জানি, যে কোন ভাষার শব্দসমূহ ঐ সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পরিম-লের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অথবা কিছু বিশেষ অবস্থার স্মারক রূপে জন্মলাভ করে অর্জন করে বিশেষ বিশেষ অর্থ ও অনুষঙ্গ-দ্যোতনা। কিন্তু জীবনের অনিবার্য প্রবহমানতায় যখন পুরাতন এসব ঘটনাপ্রবাহ ও জীবন অনুসঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন ঐ ঘটনাপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য ও ভাবকে ধারণকারী শব্দগুলিও ভাষাভাষীর দৈনন্দিন সংজ্ঞাপন-প্রতিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে কালের অতলে হারিয়ে যায়। উদহারণস্বরূপ, আজ থেকে কয়েক দশক আগেও লেখাপড়ার সাথে 'দোয়াত' কলমের ব্যবহার অনিবার্য ছিল, কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার কালিকে দোয়াত থেকে তুলে সরাসরি কলমের ভিতরে প্রবেশ করিয়েছে। তাই 'দোয়াত' শব্দটি এখন আর আমাদের ভাষিক পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত হয় না। ফলে বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মকে দোয়াত এখন চেনাতে হলে এর সংজ্ঞাসহ চিত্র এঁকে দিতে হবে।

একসময় 'নদী' আর 'বেদেবহর' বাংলার এক চিরন্তন ও সহজাত চিত্র ছিল । এখন জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে একদিকে নদী যেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, তেমনি দখলের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে নদীকে মেরেও ফেলা হচ্ছে। অন্যদিকে বর্তমানে বেদের জীবিকায়ও টান পড়েছে বলে তারা এখন সনাতনী পেশা ছেড়ে ভিন্ন ভিন্ন নতুন কর্মে যুক্ত হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেদেবহর আর তাদের আনন্দময় গর্বিত ও যাযাবর জীবনধারা এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট নানা শব্দাবলিও বাঙালির দৈনন্দিন সংজ্ঞাপনকর্মেও খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না। একই ভাবে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের নদীতীরের জেলেপাড়া, কুমারপাড়ার লোকজনও আজ তাদের পিতৃপ্রদত্ত পেশা নিয়ে বিপর্যস্ত। তাই নদীতীরের এসব পাড়ার লোকজনদের ভিন্ন পেশা গ্রহণের কারণে তাদের চিরায়ত জীবনধারায় সংশ্লিষ্ট শব্দাবলি যথা- জালফেলা, জলগালা, জল নিংড়ানো, জলটুঙ্গি (জলের মধ্যে ঘর) ডবোজল, জাউল্লাপাড়া, মাউচ্ছাপাড়া, জেলেডিঙ্গি প্রভৃতির মৃত্যু ঘণ্টাও বেজে চলছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে এ অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকলে হয়তো বাংলা ভাষার অভিধান থেকেও এ শব্দগুলো এক সময় লুপ্ত হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ করে শহরতলীতে সম্প্রতি যান্ত্রিক সভ্যতার হাওয়া লাগাতে 'লাঙ্গল' ও 'জোয়াল'-এর জায়গায় 'ট্রাক্টর' এসেছে, গ্রামেও 'লোডশেডিং' শব্দটি এখন খুব পরিচিত। 'হ্যারিকেন'র দশা এখন প্রায় নিভু নিভু। এরপর যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নেমে আসবে তাতে আর সন্দেহ নেই, সেখানে 'মোমবাতি'

বা 'কেভেল' অপরিচিত হবে না-এটা অনুমান করা যায়। এমনকি, কিছুদিন পরে, পড়ালেখা না জানা কৃষককে বিদেশ থেকে ছেলের পাঠানো 'চার্জলাইট', 'টর্চলাইট' প্রভৃতির সাথে পরিচিত হতে হবে অনায়াসে।

বর্তমানে মফস্বল ও শহরাঞ্চলে পেশাগত পরিবর্তনের কারণে নতুন শব্দ সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি, পুরাতন পেশা সংশ্লিষ্ট শব্দ ত্যাগের নমুনাও কম নেই। টাইপরাইটারের আয়ু কমে আসছে, এখন মানুষ টাইপিস্ট খুঁজে না, খোঁজে বেড়ায় কম্পিউটার অপারেটরকে। ডাকপিয়ন কিংবা সুভাষণে পোস্টম্যান বা ডাকবাবুর আয়ু ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। সার্বজনীন ই-মেইল, ফ্যাক্স চর্চা এখন সময়ের ব্যাপারমাত্র। বেসরকারী ডাক, কুরিয়ার সার্ভিসের বদৌলতে চিঠিপত্র, পার্সেলের স্থলে 'ডকুমেন্টস' এসে কড়া নাড়ছে আমাদের দরজায়। যান্ত্রিক সভ্যতার আঘাতে গাড়িয়ালরা সব এখন 'ড্রাইভার' হয়ে গেছে। গরু এবং গাড়ি শব্দ দুটোর জীবন আয়ু আরো শতাধিক বছর হয়তো থাকবে কিন্তু 'গরুরগাড়ি' আগামী অর্ধশত বছরের মধ্যে বিলীন না হলেও সহজে যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমনকি অভিধানেও, একথা অনায়াসে বলা যায়। এককালের গুরুত্বপূর্ণ বাহন 'পালকি' এখন যাদুঘর আর বাচ্চাদের ছড়ার বই ছাড়া মফস্বল বা শহরে কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু এক সময় নামিদামি ব্যক্তিদের বিয়েতে পালকি অন্যতম এক বাহন ছিল। এখন 'কার', 'মাইক্রোবাস' সেই স্থান দখল করেছে। এমনকি গ্রামেও পালকির স্থলে 'রিকশা', 'অটোরিকশা'র কদর বেড়েছে। ফলে নতুন যানবাহনের এসব শব্দ বাঙালির প্রাত্যহিক জীবন-প্রবাহের অনিবার্য অংশ।

৫.২ শব্দের দ্যোতকের অবয়বগত জটিলতা

ভাষায় বিভিন্ন শব্দ হারিয়ে যাওয়া বা ঐ ভাষিক পরিম-লে স্বচ্ছন্দে ব্যবহৃত না হওয়ার পেছনে অন্য একটি কারণ হলো শব্দের ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ, বানান প্রভৃতির জটিলতা, যাকে সংশ্লিষ্ট শব্দচিহ্নের দ্যোতকের অবয়বগত জটিলতা বলে অভিহিত করা যায়। অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য বা ধারণা না থাকার কারণেও অনেক সময় ঐ শব্দের বানান ও ব্যবহার নিয়ে সংকট দেখা দিতে পারে। বানানও এক্ষেত্রে সম্ভাব্য জটিলতা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক (সেন, ১৯৯৭) দেখিয়েছেন যে, বানান বৈষম্যের দরুন 'বিদেশীয়গণ শিক্ষা করিতে পারেন না' এবং শ্রীনাথ সেন বলেছেন 'কথিত ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, ব্যুৎপত্তি বানানকে নিশ্চয়তা দেয়' (সেন, ১৯৯৭: ১৯৩)। আবার বাংলা গদ্য সৃষ্টির শুরুতেই এর

শব্দচরিত্র নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। অনেকেই বলেন তৎসম শব্দ দিয়ে এটিকে সাজাতে হবে, আবার কেউ বলেন দেশি-বিদেশি এবং সংস্কৃতসহ প্রচলিত সকল শব্দ দিয়েই এর শব্দভা-ার গঠন করতে হবে। এই ব্যাপারে সুভাষ ভট্টাচার্যের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন-

বাংলা ব্যাকরণের মতোই বাংলা অভিধানগুলোও এখনো পর্যন্ত সংস্কৃতানুসারী, ব্যাকরণ যেন সংকলকদের তাড়া করে বেড়ায়। তাই শত শত বাংলা শব্দকে সংকলকরা 'অশুদ্ধ' হিসেবে গণ্য করেন। ইতোমধ্যে, কর্ষিত, একত্রিত, উপরোক্ত, ভাসমান, মজ্জমান, সক্ষম প্রভৃতি বাংলা শব্দকে অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত অর্থে শুদ্ধ বলার অর্থ বাংলাভাষার প্রকৃতিকে অস্বীকার করা। (ভট্টাচার্য, ১৯৯২)

প্রকৃতপক্ষে প্রবল সংস্কৃতানুসারী পি-তেরা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বানান ও অর্থের অজুহাতে 'অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত শুদ্ধ' নামক একটি প্রয়োজনীয় তিলক পরাতে চান। এই কারণে সৃষ্ট বাংলা বানানের জটিলতাও শব্দের চলমানতার পথে আরেক বাধা। আমরা 'ব্যয়' লিখবো না 'ব্যায়' লিখবো এই দ্বন্দ্বে পড়ে খরচ লিখাই সঙ্গত মনে করি। লক্ষ্য (উদ্দেশ্য), লক্ষ (সংখ্যার ক্ষেত্রে) এখন এক বানানে চলছে 'লক্ষ' রূপে। সাধারণ লেখাপড়া জানা মানুষ অঞ্জলির যুক্ত বর্ণটি কী হবে 'ল' এ 'দীর্ঘ-ই-কার (ী)' না হ্রস্ব-ই-কার (ি)' এই চিন্তায় পড়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠাতে গিয়ে পাঠক শেষপর্যন্ত শ্রদ্ধা পর্যন্ত লিখেই ক্ষান্ত হয়। ণ- ত্ব আর ষ- ত্ব বিধানের বিভ্রান্তিতে পড়ে হর্ণ, মডার্ণ, ষ্টেশন প্রভৃতি ভুল বানান স্বাধীনভাবে চলছে। আর তিন 'শ'-এর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন,- "বাবা, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে গিয়ে ষত্বে ণত্বে কিংবা হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরে যদি ধাঁধা লাগিয়ে দেয় তাহলে লিখে দিয়ো 'ঠা-া হাওয়া' (ঠাকুর, ১৯৩৮)। এভাবে 'আকাঙ্ক্ষা' লিখবো বা 'আকাঙ্খা' হবে; 'শাদা' শুদ্ধ না 'সাদা' গ্রহণযোগ্য, অথবা 'জিনিস' বা 'জিনিশ' কোনটি সঠিক, এই মতভেদে পি-তেরা হিমশিম খাচ্ছেন বেশি। এ কথা সত্যি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তির যুক্তি এতই জোড়ালো এবং মূল শব্দ ও তার তদ্ভব রূপের সন্নিধি এতই স্পষ্টই যে মূলে 'ষ' বা 'স' থাকলে চট করে তাকে 'শ' করা কঠিন। 'ষ' থেকে ষাঁড় এবং দস্যু থেকে দস্যি এমনি দুটি দৃষ্টান্ত। আবার যেসব দেশজ শব্দে ব্যুৎপত্তির নিয়ম চলে না, ব্যুৎপত্তিটাই যেখানে অজ্ঞাত বা অস্পষ্ট, সেখানে

তালব্য-শ এর প্রবেশ অবাধ নয়। উসকে দেওয়া, চুপসানো এসব শব্দে তালব্য-শ-এর ব্যবহার কি সঙ্গত হতো না? একালের ভাষাচিন্তাবিদদের কেউ কেউ আমাদের বানান সমস্যার এই দিকটি বেশ ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন (ভট্টাচার্য, ১৯৯২)।

৬. উপসংহার

শব্দ হলো বিভিন্ন প্রকার ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের এক পুঞ্জীভূত রূপ। এসব ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের তথ্যাবলি আহৃত হয় শব্দটির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, রূপ-ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাগর্থ, অন্বয়, রূপান্বয়, টেক্সট, ব্যাকরণ, ব্যুৎপত্তি, উপমা, ডিসকোর্স, প্র্যাগম্যাটিক্স এবং অন্যান্য উৎস থেকে (পিংকার ১৯৯৫,৩৪৪)। তাই এক জটিল ভাষিক সংমিশ্রণ শব্দের প্রতিটি নতুন অর্থকে যদি অভিধানের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে অভিধানের আকার ক্রমাগত বাড়তে থাকবে এবং ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা প্রচুর অসুবিধার সামনে পড়বে। কারণ প্রতিটি শব্দের জন্য তাদের জানতে হবে অনেক অর্থ। অন্যদিকে শব্দার্থের নমনীয়তা যদি নষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে নতুন প্রতিবেশে নতুন অর্থ জ্ঞাপনের যে ক্ষমতা, তা প্রসারিত নাও হতে পারে। তাই শব্দার্থের বৈচিত্র্য বজায় রাখা উচিত, যাতে নতুন নতুন প্রতিবেশে নতুন অভিজ্ঞতা বা ধারণা প্রকাশ করার জন্য একই শব্দকে নতুন অভিজ্ঞানরূপে ব্যবহার করা যায় (দাশ, ২০০৪)।

পরিশেষে বলা যায়, শব্দই ভাষার প্রাণ। এই প্রাণের স্পন্দনে ভাষার জীবনপ্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখতে শব্দের যথার্থ পরিচর্যা একান্ত অপরিহার্য, বিশেষ করে ক্রমাগত নতুন শব্দ সৃজন করে ভাষা তথা ভাষীর প্রকাশ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলা এবং একটি ভাষিক পরিমণ্ডলে দীর্ঘদিনের ব্যবহার্য শব্দরাজিকে অপ্রচলনের হাত থেকে রক্ষা করা।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (১৯৯৮) *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

– – (১৯৯২) প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞান। সমীরণ মজুমদার (সম্পা.) *প্রসঙ্গ : ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান*। মেদিনীপুর : অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। পৃ. ৯-২৪

আরিফ, হাকিম (২০১১) চিহ্ন সংবীক্ষণ : সোস্যুরীয় তত্ত্ববিশ্ব। *সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা : ১-২*, পৃ. ২১-৩২

– – (১৯৯২) নজরুলের শব্দ সৃজন প্রক্রিয়া। *সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ ৪২, সংখ্যা : ১*, পৃ. ২৮৭-৩০২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৩৮) *বাংলাভাষা পরিচয়*। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।

দাস, রমাপ্রসাদ (১৯৯৫) *শব্দ ও অর্থ*। কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

দাশ, নিলাদ্রিশেখর (২০০৪) শব্দের অর্থ ও প্রতিবেশ। *ভাষা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১ পৃ. ৮০-৯৪*

সেন, শ্রীনাথ (১৯৯৭) প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান। হুমায়ুন আজাদ (সম্পা.) *বাঙলা ভাষা, প্রথম খণ্ড*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী। পৃ. ১৯৫-২২২

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (১৯৮৫) *বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি*। কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, সুভাষ (১৯৯২) *বাংলাভাষা চর্চা* । কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।

Pinker, Steven (1995) *The Language Instinct: the new science of language and mind.* London: Penguin

Malinowski, Bronisław Kasper (1923) The problem of meaning in primitive languages. Supliment to C.K. Ogden and I.A Richard (1923) *The meaning of meaning.* London: Kegan and Paul